# ঝাড়খণ্ডের গল্প

সুধীর করণ

গ্রন্থতীর্থ

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

# সূচিপত্র


শালবনে বৃষ্টি ..... ১৩
প্রেমের জন্ম ..... ১৯
ধনঝুরি পাহাড়ের পায়রাবাসা ..... ২৮
গবরমিন্টের দেশ ..... ৪০
ভূদান ..... ৫০
অরণ্যচারী ..... ৫৯
মুর্গিলড়াই ..... ৬৪
সোনার পিসি ..... ৭০
শীতের রাত ও ঘাসফুল ..... ৮০
অবসাদ ..... ৮৭
ফাঁসি ..... ৯৫
ভাটাইজোড়ের বন্যা ..... ১০১
ডাইনি ..... ১০৬
শপথ ..... ১১৩
আমজাদ আলির বক্‌রী ..... ১২১
শিকার ..... ১২৬
উৎকোচ ..... ১৩৫

# শালবনে বৃষ্টি

সবাই স্বপ্ন দেখে ; রাতেও দেখে, দিনেও দেখে। জেগেও দেখে, ঘুমিয়েও দেখে। সেসব স্বপ্নের মাথা আছে না মুণ্ডু আছে। সারসাবেড়া গাঁয়ের মকরা মালের মেয়ে কালীও স্বপ্ন দেখে। ওর বুকের মধ্যে এখন একটা শিরশিরে হাওয়া। কালী বুঝতে পারে সে যেন হঠাৎই বদলে যাচ্ছে। সে অবাক হয়ে দেখে তার বুকের উপর মাথা তুলছে দুটো গোল গোল কুঁড়ি। ফুলের কুঁড়ি নয়, ঠিক যেন বৃষ্টিবাদলে শালবনে খুঁজে পাওয়া গোল গোল ছাতু। বর্ষা নামলেই কিশোর কিশোরী ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে শালবনে ছাতু কুড়োতে যেতো। হঠাৎই খুঁজে পেতো— মার্বেলের মতো দেখতে, কুড়কুড়ে ছাতু শালগাছের নীচে ঝাঁক বেঁধে উঁকি দিচ্ছে। ছাতু দেখলেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তো কুড়কুড়ে ছাতু কুড়োবার জন্য। মাটির নীচে তাদের জন্ম। একসময় ফুলে উঠতো বেলে মাটি। বৃষ্টি হলে ওদের সাদাটে মাথাগুলো দেখা যেতো। সারা শালবন জুড়ে ছাতুর মেলা। ছাতু মানে ব্যাঙের ছাতা নয় — কত রকমের ছাতু যে বনেবাদাড়ে দেখা দেয়—তাদের নামও কত —পরব ছাতু, পোয়াল ছাতু, কুড়কুড়ে ছাতু, মৌঢাল ছাতু — আরও কত কী!

কালী একসময় নিজের বুকে হাত দিয়ে বুঝতে পারলো, ওর বুকের উপর গোল গোল দুটি ছাতু যেন ফুটে বেরুতে চাইছে। দেখতে দেখতে সেই ছাতু কুল-আঁটির মতো শক্ত হয়ে উঠতে লাগলো ; তার চারদিকের মাংসপেশী ক্রমে ক্রমে ফুলে উঠতে লাগলো— ঠিক যেন ছোটো আঁজির। এ সবের মানে কী তা না জানলেও কালীর মনে একটা শিরশিরে হাওয়া বইতে লাগলো। তাই কালী এখন, যখন শালবনের কাছের মাঠে গেরস্থদের গোরুবাছুর আটকে রাখতে যায়, অন্যসব বাগাল-রাখাল ছেলেদের সঙ্গে, তাকে প্রায় সারাদিনই থাকতে হয় শালতলার মাঠে, সন্ধের আগে গোরুবাছুর গেরস্থদের গোয়ালে জমা দিয়ে, তবে কাজ শেষ। একেবারে ঠিক গোধূলিলগ্নে গোরুবাছুর গোয়ালে ঢোকে। কালী সবসময়ই প্রায় একটা ময়লা গামছা দিয়ে শরীর ঢেকে রাখে, ঠিক যেন মোরগ-মা তার বাচ্চাদের আগলে রাখে তার ডানার তলায়।

আসলে ওই গোরুবাগালী কাজটা কালীর নয়, কালীর বাপের— যার নাম মকরা ; মকর সংক্রান্তির দিনে জন্ম বলে তার ওই নাম। ওর মেয়ে কালী জন্মেছিল ঘোর অমাবস্যায়। গায়ের রঙও কুচকুচে কালো। কালীর মা যেতো পাশের চাষিদের গ্রামের গেরস্থ বাড়িতে ঘর নিকোবার জন্য, বাসন মাজার জন্য, আর মকরার কাজ ছিল গোরুবাগালী করা। কালী আগে ঝোপঝাড় থেকে কাঠ কুড়োতো, কিংবা এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াতো, কিংবা জাহের থানে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে চু কিৎ কিৎ খেলতো। কোনো কোনো সময় ভেঙে আনতো শালপাতা কিংবা দাঁতনকাঠি। আবার শুশনি কলমি গেঁড়ি গুগলির খোঁজে পুকুর-গড়েতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো, ছাতু কুড়োতে যেতো, সই-সাঙাতিনদের সঙ্গে গামছা দিয়ে ছেঁকে চুনোপুঁটি মাছ ধরতো। এইভাবেই সে বড়ো হচ্ছিল। ইস্কুল টিস্কুলের ধারেকাছেও যেতো না। ওর মা বাবাও কোনোদিন যায় নি। ওসব লিখাপড়ার কাজ ওদের জন্য লয়। তারপর হঠাৎই একদিন মকরা ওকে গোরুবাগালীর কাজে লাগিয়ে দিল। কাজটা যদিও মকরার নিজের-তবু মকরা দিনের বেলায় খড়্গপুর না কোথায় যেন চলে যায়, অনেক রাতে ফেরে। এর মধ্যে কালীর বয়স দশ পেরিয়ে বারোর দিকে। কালী অবশ্য

তার বয়সের হিসেব জানে না। কিন্তু মায়ের কাছে শুয়ে তার চোখেও এখন জোনাকীর মতো ঝাঁকে ঝাঁকে স্বপ্ন উড়ে বেড়ায়। কালীর মুখে এখন লাজুক লাজুক ভাব, চোখের পাতায় খঞ্জনা পাখির নাচ।

কালী মাঝে মাঝে এমন স্বপ্নও দেখেছে— সে যেন বউ হয়ে গেছে—তার পরনে রঙিন শাড়ি, মাথায় সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে ঘোমটা টানা ; হাতে রুনুক ঝুনুক চুড়ি। পাড়ার বউদের তো সেই ছোটোবেলা থেকেই দেখে আসছে। ওর মাকে দেখেও বউ মনে হয়েছে, যদিও মালপাড়ার বউরা ধান কাটতে যায়,—শালপাতা তুলতে যায়, গুগলি কুড়োতে যায়। আর কত কি করে, বাড়িতে এসে রান্না করে, চুলও বাঁধে, ছেলেমেয়েদের মাই খাওয়ায়, —আবার ওই বউরা রাতের বেলায় তাদের বরের সঙ্গে শুতেও যায়। কালীর বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে। কালী কী চায়, তাও তার কাছে স্পষ্ট নয়, তবে সে আর কালী হয়ে গোরুবাগালী করতে চায় না। পেটে খিদে থাকলে নিজে চাইবে এ তো স্বাভাবিক। মাঝে মাঝে বলবে— হেঁ মা, অনেকদিন ডাল খাই নাই, খালি গুগলির ঝোল আর ছাতুপোড়া আর ভালো লাগে না। হেঁ মা — একদিন ডাল করবি? মা বলে — ডাল কুথা পাবরে ধন, আমাদের কি জমি না জেরাৎ, চাষ না বাস; খেটে খেটে মর, আর ঘর ভর্তি কর। কালীর মা বেশ ছড়া কাটতে পারে। বেশ মজা লাগে কালীর। কালীর সঙ্গে মায়ের ভাবসাবও বেশি। মকরাও মেয়েকে খুব ভালোবাসে। ডাল খাবার ইচ্ছে হয়েছে শুনে একদিন মুসুরির ডাল নিয়েও এলো। মকরা এখন কোত্থেকে কী আনে, তা ওর বউও জানে না, কালীও জানে না। তবে মকরা মকর পরবে কালীর জন্য আর ওর মায়ের জন্য ফ্রক, শাড়ি, চুড়িও কিনে আনে খড়্গপুর বাজার থেকে। নিজের বেলায়—মকরার কিছুই থাকে না। তবে নেশাভাং থাকে। সারসাবেড়া গাঁয়ের একটু দূরেই মাতালের হাট। হাঁড়িভরা চোলাই মদের সে কী বিক্রি! বাপরে, বাপ্, ঢকঢক করে খাচ্ছে, —বাবুভায়ারাও ; একদিকে হাঁড়িয়া নিয়ে বসে থাকে সাঁওতাল মেয়েরা, একদিকে শুঁড়িখানা, ফুলুরির দোকান। গরমাগরম ফুলুরি — চোলাই মদের চাট হয়ে যাচ্ছে। খা না কত খাবি খা। তবে পইসা না থাকলে খাবি কি? তাই মকরা পয়সাকড়ি পাবার অন্য রাস্তা বার করেছে। ধরা পড়লেই বিপদ!

তো মকরাদের গাঁকে গাঁ না বলে একটা পাড়া বলাই ভালো, — যদিও কোনো গ্রামের পাড়া নয়, — কয়েকটা কুঁড়েঘর নিয়ে একটা বস্তি মাত্র — চারিদিকে বাঁশঝাড়, —একটু দূরে সাঁওতালদের গ্রাম— আর জাহের থান। তার পাশেই শালবন। তেমন কিছু ঘন বন নয় — ঝোপঝাড় মাত্র। একসময় গাছপালা ভালোই ছিল, তারপর — একসময় দেখতে দেখতে বন লুটপাট হয়ে গেল, জ্বালানি কাঠের অভাবে। আসলে সারসাবেড়া হচ্ছে মুনিশ-মাইন্দারের গাঁ। ছোকরাগুলো এখন মাহিনদারের কাজ করে, কেউ কেউ ভাগে-সাঁজায় জমিও চাষ করে। এ অঞ্চলে বর্গা হয়নি। ছেলেছোকরারা খড়্গপুর বা টাটাতে গিয়ে হোটেলে বাসন মাজে ; তাতেই কত বাবুয়ানী ওদের। মঙ্গলবারের হাটে মকরা দু-একবার কালীকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। কালীর চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যায় হাট দেখে — কত লোক, কত দোকানপাট। ওদিকে জিলাপি, মিঠাই, ঝুরিভাজার দোকান তো ইদিকে ঝিলিকমারা চুড়ির দোকান। চার দিকে শুটকি মাছ, বাইগন, আলু, পিঁয়াজ কত কী। কালীর ইচ্ছে হয় সব যেন কিনে নিয়ে বাড়ি যায়। মকরা ওকে ঝুরিভাজা কিনে দেয়, তাতেই কালী খুশি। ঝুরি-ভাজার সবটা না খেয়ে, কিছুটা ওর মায়ের জন্য নিয়ে যায়।

গেরস্থবাড়ির ছেলেরা ইস্কুলে পড়তে যায়, সেজেগুজে। কালী ওর সখীদের বলে— উয়াদের বড়ো মজা লয়। কুছু কাজ করতে হয় না, তাই না। সঙ্গীদের একজন বলে— উয়াদের অনেক জমিজেরাত আছে—তাই পড়ালিখা ছাড়া আর কী করবেক উয়ারা? মজা তো হবেকই।

তখন বর্ষাকাল। হঠাৎই ঝমঝম করে এক পশলা বৃষ্টি। প্রায় সকলের হাতেই তালপাতার ছাতা। যাদের ছাতা নেই, তারা অন্য কারুর ছাতার নীচে মাথা গুঁজে মাথা বাঁচায়।

কে বাঁশি বাজাচ্ছে রে? কালীর কান খাড়া হয়ে উঠলো। বুকের মধ্যে টিপ টিপ শব্দ। টিপ টিপ নয়, টিপ —টিপ—। কালীর বুকের মধ্যে টুপুর টাপুর বৃষ্টি পড়ছে যেন। গা শিউরে ওঠে। কালী ওকে ভালোভাবেই চেনে। বর্ষার জল ছোটো নালা দিয়ে বন থেকে বেরিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে নীচের দিকে। মাঠের উপর দুটো ঢ্যামনা সাপ জড়াজড়ি করছে। কে একজন মারলো ছুঁড়ে খেঁটে লাঠি। সাপদুটো পালাবার চেষ্টা করেও পারলো না। আবার লাঠি। একেবারে মোক্ষম মার ; একটা সাপের শিরদাঁড়াই ভেঙে গেল। আর একটা লাফিয়ে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়লো। এই প্রথম কালীর মনে খুব কষ্ট হলো। বললো— কেনে মারলি উয়াদের? উয়ারা ত চলেই যেতো। জোড়-যাওয়া সাপকে মারতে নেই। কালী অবশ্য জোড়-যাওয়ার মানে যে ভালোভাবে বুঝতো তাও নয়। যা শুনেছে তাই বললো। একেবারে ফাঁকা মাঠ। সবুজ ঘাসে ভরা। কাছেই জাহেরা থান—বড়ো বড়ো কয়েকটা শালগাছ কতদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে। বর্ষা যখন ঝম ঝম করে পড়ে, তখন সবাই শালগাছের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। গোরু বাছুরের পাল মাঠে ভিজে ভিজে ঘাস খায়। তবু ওদের দিকে নজর রাখতে হয়। নইলে পাশে কাঁদরে ঢুকে পড়লে আর খুঁজে পাওয়া দায়। তেমন তেমন উদ্‌মো গোরুর গলায় অবশ্য কাঠের ঘণ্টা বাঁধা — যার নাম ঠরকা। মুখ নিচু করে মাথা নেড়ে ঘাস খায় বলে ঠুড়ুক ঠুড়ুক শব্দ হয় ঠরকা থেকে। এইভাবে কালী নিজেরই অজান্তে আর এক কালী হয়ে উঠেছিল। এখন তো কালী আর বাড়িতে থাকতেও চায় না। মাঠে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে চু কিৎ কিৎ খেলতেই ভালো লাগে।

আকাশে যখন কালো মেঘ জমতে থাকে, তখন কালীর মনেও একটা উদাস উদাস ভাব দেখা দেয়। কালী আকাশের দিকে তাকালো, আকাশভরা মেঘের কালো ছায়া। বৃষ্টি যে-কোনো সময় নামতেই পারে। ছায়াটা শালবনের দিকে এগিয়ে আসছে। কালীর নিজের ছাতা নেই বলে কারুর ছাতার নীচে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়াতে হয়। শরীর শিউরে ওঠে বৃষ্টির ঠাণ্ডা বাতাসে না অন্য কারণে, কালী তা জানে না। কালী ভাবলো বৃষ্টি যখন ঝমর ঝমর করে মাঠ ভাসাবে, তখন সে জাহেরা থানের ওদিকে একাই গিয়ে একটু ভিজবে। বৃষ্টির মধ্যে ওকে কে আর দেখতে পাবে। তবু ভয় ভয় করছিল—যদি কেউ দেখে ফেলে! বুকে হাত বুলিয়ে চমকে উঠলো কালী। একটু বড়োসড়োই মনে হলো। তা ওই লখে ছোঁড়াটা বদ্‌মাশ আছে বাপু। ওর দিকে তাকায় আর মুচ্‌মুচ্‌ করে হাসে। লখেটাও ডাগর হল্‌ছে। উপর-ঠোঁটের উপর রেশমী চিকন আবছা দাগ পড়ছে। লখে একদিন কালীকে ডাঁসা পেয়ারা দিয়ে বলেছিল—খা কেনে, খুব ভালো লাগবেক। বলে, নিজেই আর একটা ডাঁসা পেয়ারায় কামড় দিয়েছিল। কালীও কামড় বসালো।

একদিন লখেটা বললো কী — এয় কালী, বনে যাবি?

চোখ বাঁকা করে কালী বলেছিল— কেনে রে, ছাতু কুড়াতে যাবি নাকি। লখে বললো — চ না, লুকলুকানি খেলবো। মজা হবে। তুই লুকাবি, আমি তোকে খুঁজবো।

কালী কোনো জবাব দিল না। কিন্তু ওর সর্বাঙ্গে একটা চড়ুই পাখি সেদিন ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে ডানা ঝাপটালো। কালী কী যেন ভাবলো, তারপর বললো—তুর বড়ো শখ লয়? তারপর আবার ট্যারা চোখে তাকালো লখের দিকে।

লখে বলেছিল—মাইরি কালী দারুণ মজা হবে, চ না — যাবো আর আসবো। কেউ জানতেও পাবে না।

কালীর যে লখের সঙ্গে বনে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু না বাবা উ আখুন ডাগর হল্‌ছে। মা শুনলে বাখান দিয়ে ভূত ভাগাবেক। বললো—আর বনে যাঁয়ে খেলতে হবেক নাই; তোর গোরুগুলাকে দেখ — কত দূর চলে গেছে।

লখের সাহস যেন বাড়ছে। কালীর পাশে এসে বললো—বনের মধ্যে একটু শুয়ে থাকি। কী মজা হবে দেখবি।

কালী এবার ফোঁস করে উঠলো। বললো — দেখ লখে, ভালো হবেক নাই বলছি। তারপর আর না দাঁড়িয়ে দৌড় দিয়েছিল অন্য সখীদের দিকে। এরপর আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো। প্রথমে টাপুর টুপুর। তারপর বড়ো বড়ো ফোঁটা। গোরু বাছুরগুলোকে খেদিয়ে এনে সবাই জড়ো করলে জাহেরা থানে। এবার ঝম ঝম করে বৃষ্টি। শালবন অন্ধকার। ছেলেরা তালপাতা শালপাতার ছাতার নীচে হুমড়ি খেয়ে বসে পড়লো। শালবনের ভিতর থেকে গেরুয়া জল সাপের মতো এঁকে বেঁকে বেরিয়ে পড়লো। ভরে গেল খানাখন্দ। ফাঁকা মাঠের উপর সে কী বৃষ্টির মাতন!

কালী গোরু খোঁজার অছিলা করে ভিজতে গেল মাঠে। জাহেরা থানের বড়ো একটা শালগাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। গায়ের গামছা খুলে ফেললো। ওর পরনের গামছাটা লেপ্‌টে বসে গেছে ওর পাছায় আর পায়ে । ওর কালো কুচকুচে চুলের গোছা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ওর মুখে — চোখে বুকে-পেটে। কালী হাঁ করে করে জলের ফোঁটা গিলছে। ওর সেই ছোটো বাটির মতো উপুড়-করা স্তনদুটির মাঝখান দিয়ে জলের স্রোত। ছোটো দুটি দ্বীপের মতো সেই দুটি স্তনের মাঝখান দিয়ে জলের স্রোত। কালী জানে, তাকে কেউ দেখছে না। তাই হি হি করে কাঁপতে কাঁপতেই বলে উঠলো—আয় বিষ্টি ঝেঁপে—ধান দুব মেপে। বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর ওপর। ঝাপসা হয়ে যাওয়া মাঠের দিকে তাকিয়ে কালী নিজের শরীর দেখে অবাক হলো। তারপর সেই দিগন্তবিস্তারী মাঠে কালী যেন হারিয়ে গেল। গেল হারিয়ে; কোথায় চলে গেল। কিন্তু যাবে কোথায়। ওর নিজের বাড়িতে ফিরে গেল না। পাশের গাঁয়ের গেরস্থদের বাড়িতে — কপালে সিঁদুরের টিপ — সিঁথিতে সিঁদুর — মাথায় সামান্য ঘোমটাটানা। ওর দুহাতে ঝুনুঝুনু করে বেজে উঠলো চুড়ি আর বালা। নাকে নাকছাবি, দুকানে সোনার রিং। কে যেন বলে উঠলো — ও বউ ভিজিস না, ঠাণ্ডা লেগে মরবি যে। কালী জিভ বার করে মুখ ভেংচালো। বেশ করবো — ভিজবো। কালী এবার জাহেরা থানের দিকে তাকালো। গোরুবাছুরগুলো ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। কিন্তু ছেলেরা গেল কোথায়! ওরা তালপাতার ছাতার নীচে উবু হয়ে বসে আছে। আর সেই লখে ছোঁড়া। বলে কিনা বনে গিয়ে শোবে। সখ কত। তারপর ভাবলো — লখাইর মন-ট ভালো বেটে।

চোখ খুললো কালী। বৃষ্টির দাপট একটু কমেছে। কিন্তু সবুজ মাঠের ঘাস আর কাজুবন-বাঁশবন-শালবন তখনও ঝাপসা। ঢালু জায়গা দিয়ে ছোটো ছোটো নালি তৈরি হয়ে গেছে। ঠিক যেন খেলাঘরের নদী। কী সোন্দর! কালী জানে না সুন্দর কাকে বলে, কিন্তু অনায়াসে বলতে পারে কী সোন্দর। আজ মনে হলো ওর নগ্ন শরীরটাও সোন্দর, বাঁশবন-শালবন, গড়িয়ে আসা জল, জাহেরা থান, বাগাল ছেলে এমন কি লখেও সোন্দর। কালীর চোখে এই বর্ষা যেন

মায়ার কাজল পরিয়ে দিয়েছে। মনে হচ্ছে সবচেয়ে সোন্দর ওই ছট্‌ফটে বাছুরগুলো আর শান্ত শীতল দুধালো গাইগুলো। এতসব ভাবতে ভাবতে কালীর কপাল গড়িয়ে কয়েক ফোঁটা জল ওর মুখের মধ্যে ঢুকে পড়লো হঠাৎ। কালী বললো — আঃ! কালী আবার আওড়ালো — অবশ্য নিজের মনে, যাতে বাইরের কেউ শুনতে না পায় — আয় বিষ্টি ঝেঁপে, ধান দুব মেপে — এবং কালী অবাক্ হলো। সত্যি সত্যি ঝমঝম করে আবার এক পশলা বিষ্টি নেমে ওর সর্বাঙ্গ ধুয়ে দিতে লাগলো। বিষ্টিকে চলে যেতে বলার জন্য একটা ছড়াও সে জানে — কিন্তু তা আর তার জিভের ডগায় এলো না। ওর শরীর শিউরে উঠলো। একটু কাঁপুনি দেখা দিল, ওর শরীর কোথায় যেন আশ্রয় খুঁজে বেড়ালো। মনে পড়লো— মায়ের গা ঘেঁসে চুপটি করে শুয়ে থাকার ছবি। বৃষ্টির দাপট কমলেই বাগালছেলেরা গোরু বাছুরগুলোকে একসঙ্গে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। গাঁয়ে পৌঁছে দিলে ওরা যে যার ঘর চিনে নেবে ঠিক — নিজেরাই যে যার গোয়ালে ঢুকে পড়বে। কিন্তু আকাশের আজ হলো কী। কালীকে ফাঁকা মাঠে যেন একলা পেয়ে লুকোচুরি খেলছে। হেই বিষ্টি, তো — নেই বিষ্টি। থামবার লক্ষণ মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছে কিন্তু হঠাৎই ঝড় ঝড় করে ঢেলে দিচ্ছে বড়ো বড়ো ফোঁটা। কালী এবার সত্যি সত্যি হি হি করে কেঁপে উঠলো। ভিজে গামছাটা গায়ের উপর আলতো করে ঢেকে দিল। কিন্তু তাতেও মনে হলো — এত ভিজেও ওর বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা গরম হাওয়া বয়ে গেল। কালীর পায়ের নীচে সবুজ ঘাস আর বেলে মাটি। শিথিল পায়ের নীচে পাতাভেজা জল। শীতের বাতাস পেলে শরীর যেমন কেঁপে কেঁপে ওঠে তেমনি একটা শিহরণে কালী কেঁপে কেঁপে উঠলো। অবাক হয়ে হঠাৎই লক্ষ করলো — ওর দুই জঙ্ঘা বেয়ে হালকা রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ভয়ে বিস্ময়ে ওর মুখে এক অসহায় বেদনার ছাপ। রক্তের ধারা পায়ের পাতা ছুঁয়ে সবুজ ঘাসে মিশে যাচ্ছে। কালী বুঝতে পারলো না, রক্ত আসছে কোত্থেকে। সে প্রায় অসহায় হয়ে পড়লো। বুঝতে পারলো না কী করবে এখন। মেঘ বললো — ভয় নেই গো মেয়ে, ধুয়ে দিচ্ছি— এক্ষুনি। কালী বললো — আমি মরে যাবো না তো! মেঘ বললো, — মরবি কি, এখন থেকে তুই বড়ো কালী হয়ে গেলি। এসব কথা কালীর কানে ঢুকলো না। চারদিকে তাকিয়ে, পরনের গামছা খুলে চট্‌পট নিংড়ে নিলো সে। গায়ের গামছা খুলে দেখলো একবার। সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখে মুখে একঝাঁক লজ্জা এসে পড়লো। বিস্ময়, লজ্জা, ভয় আর ব্যথা মিলে সেই মুহূর্তেই কালী যা চেয়েছিল যেন তাই হয়ে গেল। যেন গাঁয়ের বউ হয়ে গেল। আরও লজ্জা পেলো কালী। জাহেরা থানের দিকে তাকিয়ে দেখলো — নাঃ — ওকে কেউ দেখতে পায়নি। ছেলেরা গোরুবাছুর তাড়িয়ে গাঁয়ের দিকে যাবার উজ্জুগ করছে। ওরাও ভিজেছে কিন্তু কালীর মতো খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে ভেজেনি। এবার কালী শুনতে পেলো লখে হাঁকছে — এয়্ — কালী — আর ভিজিস না, সন্নিপাতে মরবি যি। তোর গোরুগুলো আমি খেদাড়ে লিয়ে যেছি — তুই পিছু পিছু চলে আয়। কালী হাত নেড়ে সম্মতি জানালো। লখাই ভাবলো — হলো কী কালীটার — এমন ভিজে মরছে কেন?

কালী তখনও দাঁড়িয়ে। বাড়ি ফিরলেই মায়ের বকুনি খাবে। বলবে — ইস্, এমুন করে ভিজলি, কারুর ছাতার তলায় গেলি না কেন? মরবি যে জ্বরজারি হঁয়ে। ঠিক এই কথাই বলবে ওর মা।

কালীর চোখ দুটো জলে ভরে গেল। তা হলে কি সত্যি সত্যি মরে যাবে! ভাবলো — রক্ত পড়ার কথাটা মাকে বলবে না। শুনলেই বক্‌বে — হতচ্ছাড়ি কুথায় হঁচট খালি।